ভগ্ন দ্যূত

শোভন তরফদার

> বিরাট কহিলেন — হে কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল, তবে অন্য আমোদে আমার প্রয়োজন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না...
>
> — কুরু-পাণ্ডব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০৫ : প্রথম সংস্করণ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)

সংস্কৃতিবিদ্যার ভাবুকরা খেয়াল করেছেন, লাস ভেগাসের বিলাসবহুল ক্যাসিনোগুলির অন্দরে জানলা থাকে না, দেওয়ালে কোনও ঘড়িটড়িও থাকে না, যেখানে সময়ের একটা হদিস পাওয়া যাবে, বোঝা যাবে, এটা দিবাভাগ বা নিশাকালে ঠিক কোন সময়। তাঁরা ভাবতে চেয়েছেন, কেন থাকে না? জুয়ার ঝকঝকে পরিকাঠামোর পাশাপাশি কী থাকে সেই অন্দরমহলে? শুধুই অফুরান খাদ্য, পানীয় আর লাস্য? শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা?

রবি ঠাকুরের গানের চরণটিতে আরও কিছু শব্দ ছিল; শুধু মিছে কথা, ছলনা। সেগুলি আপাতত উহ্য রাখা হল, কারণ জুয়াখানার ভিতরে 'মিথ্যা' আর 'ছলনা' এই শব্দদু'টির চেহারা আর চালচিত্র বদলে যায় ঢের। যাঁরা সেখানে প্রবেশ করেন, তাঁরা জেনেই ঢোকেন যে, এই পরিসর বহির্পৃথিবীর থেকে আলাদা। এমন নয় যে বাইরের দুনিয়া আকাঁড়া সত্যাগ্রহী, কিন্তু সেখানে সত্য এবং মিথ্যা, নামান্তরে সত্য এবং অ-সত্যের ভিতরে যে ভাগাভাগি, তা এই পরিসরের তুলনায় আলাদা। এই স্থানখণ্ডটি বিশিষ্ট, কারণ এই পরিসর আক্ষরিকই, নিয়তিময়। সেখানে নিত্যনিয়মিত চলেছে একটি আলোকোজ্জ্বল, স্পেকট্যাকুলার এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। আনাতোল ফ্রাঁস-র কথায়, "a hand-to-hand encounter with Fate"[1] — নিয়তির সঙ্গে লড়াই।

গর্ভগৃহগুলি বাতায়নহীন, প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণপথ আছে ঠিকই, কিন্তু অন্দরে থাকাকালীন বাইরে কী অবস্থা, তা জানার কোনও রাস্তা নেই। জানার ইচ্ছেও কি আছে? দ্যূতক্রীড়ার পরিসর সেই জাতীয় অভিপ্রায় অনুমোদন করে না। কী করেই বা করবে, কারণ দ্যূতক্রীড়া (বা জুয়া, যা-ই বলা হোক না কেন) 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ'-এর সেই বিচিত্র সময়ভোলা ঘড়ির ডায়াল, যেখানে চেনা ধাঁচে সময় এগোয় না, অথচ সেই পরিসরেও প্রতি মুহূর্তে তা ধকধক করে। অর্থাৎ সময় নামক ধারণাটি দ্যূতক্রীড়ার স্থানাঙ্কে অন্য ধাঁচে বিধৃত। অ্যালান পেরো-র কথায় :

> Time then is structured in a specific way in relation to gambling; what I'll suggest to you is that gambling produces a space for the subject to act in concert with Fate.[2]

নিয়তির সঙ্গে সেই যে নিরন্তর সংগ্রামের পরিসর, তার নাম কখনও হয়ত ক্যাসিনো রয়্যাল, কখনও আবার নাট্যমন্দির।

২

ব্রাত্য বসুর উপন্যাস 'দ্যূতক্রীড়ক'-এর আলোচনায় উপরের অংশটি কেন এল, এবার তা বিবৃত করা যেতে পারে। কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবনবৃত্তান্ত, বলা উচিত সেই জীবনকাহিনির নির্দিষ্ট একটি অংশ অবলম্বনে একটি আখ্যান রচনা করেছেন উপন্যাসকার। সেই আখ্যানে, শিশিরকুমারের অনুষঙ্গেই, আরও অনেক স্বনামধন্য (এবং বেশ কিছু তুলনায় অপরিচিত) চরিত্রের প্রবেশ। এখানে খেয়াল করা জরুরি, এই কথাবৃত্ত যখন গড়ছেন তিনি, তখন তাঁর ভাবনায় বিদ্যমান দ্যূতক্রীড়ার ধারণা। উপন্যাসের একেবারে অন্তিম অংশে প্রয়াত পিতার সঙ্গে একটি অলৌকিক সংলাপে সরাসরি বলেই দেন শিশিরকুমার :

> হ্যাঁ, আমি এইরকম জুয়াড়ি হয়েই বাঁচবো। আর ক্রমাগত তিন তাস ফেলে যাবো জীবনের মাটিতে। একদিন হয়তো ইস্কাবনের টেক্কা পাবো, আর একদিন হয়তো পাব চিড়িতনের দুরি। কিন্তু আমি ধাওয়া করে যাবো। ঘোড়ায় যখন উঠেই পড়েছি তখন শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে যাবো। বদনাম, সুনাম, দুর্নাম সব একাকার করে আমি আমার বদ্ধ, দমবন্ধ করা মরা শহরের মরুভূমিতে ওয়েসিস খুঁজে যাবো। আর আমি সেটা পাবোও। একদিন আসবে, তখন সেই ওয়েসিসের ধারে বসে আমি দুদণ্ড ঠাণ্ডা জল খাবো। আপনি দেখবেন, সেইদিন আসবেই।[3]

ঠিক যেন বিভ্রমশীল একটি ক্যাসিনোর মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তিনি। সেখানে সময় বহমান, তবে তা চেনা দুনিয়ার সময়-ছবি নয়। তিনি নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন যেন, কখনও হাতে ইস্কাবনের টেক্কা, কখনও চিড়িতনের দুরি, কখনও আলো এবং কখনও অন্ধকারে বেজে চলেছে কালের মন্দিরা। বলা উচিত, স্থান-কালের মন্দিরা। বর্তমান আলোচকের মতে, এই উপন্যাসের উজ্জ্বলতম মাত্রাটি হল, এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে স্থান-কালের বিস্ময়কর সংযুক্তিকরণ। একুশ শতকে এসে যথেষ্ট ক্লিশে যে ইতিহাসের ভূগোল থাকে এবং ভূগোলেরও ইতিহাস। স্থানের অনিবার্য মাত্রা যখন কাল, তখন এই জোটবন্ধন হবেই। মুশকিল হল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বিশেষত কোনও কিংবদন্তি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যানে সেই মানুষটিকে নিয়ে ভাবের ঘোর অনেক সময় এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, সেই ব্যক্তির স্থানাঙ্ক এবং সময়াঙ্কের বিন্দুগুলি পিছনে চলে যায়, কার্যত ঝাপসা হয়ে পড়ে।

এই উপন্যাসে শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং সমকালীন রঙ্গসমাজের প্রেক্ষিতে ব্রাত্য বসু স্থান ও কালের সেই জোড়কলমটি ঘটিয়েছেন। যে ভূগোলের বিবরণ বারংবার দেখা দিয়েছে এই আখ্যানে, তা বহুমাত্রিক। মানচিত্রের দিক থেকে দেখলে, প্রায় ভুবনজোড়া। বিশ শতকী পরাধীন ভারতের কলকাতা যেমন আছে, তেমনই সমসময়ের মার্কিন মুলুক। স্থানসমূহের নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন কাহিনিকার। পাঠ করতে বসে তদানীন্তন কলকাতা, বিশেষত তার উত্তর ভাগ, নিজস্ব অলি-গলি সমেত, চক্ষুর সমীপে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। পথের পাঁচালি তো বটেই, বিভিন্ন বাড়ির সদর এবং অন্দরের টোপোগ্রাফিও ফুটে ওঠে স্পষ্ট।

এই সব মিলিয়েই শিশিরকুমারের নিজস্ব অক্ষক্রীড়ার পরিসর। সেখানেই তাঁর কেন্দ্র-চরিত্রটিকে স্থাপন করেছেন ব্রাত্য। যেন অস্থির একটি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু তিনি, সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত, তাঁকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে বিভিন্ন অস্তিত্ব। মনে রাখা দরকার, এখানে সূর্যের উপমাটি স্রেফ মহিমান্বিত ভাবরূপ হিসাবে প্রযুক্ত হয়নি, তার একটি তাপদগ্ধ মাত্রাও আছে। ঠিক যে ভাবে সূর্যের ভিতরে ক্রমাগত

বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, একই ভাবে শিশিরকুমারের জীবনবলয়েও একের পর এক অগ্ন্যুৎপাত। ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তে যেমন, তেমনই গণপরিসরে তাঁর উপস্থিতিতে। কখনও তাঁর স্ত্রী আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন, কখনও শিশিরকুমার অযোগ্যদের দ্বারা অপমানিত ও বিতাড়িত, কখনও পাশার দান তাঁর প্রতিকূল, কখনও কাছের মানুষজন বিশ্বাসঘাতী — এবং কখনও তিনি নিজস্ব রিপুদহনে অস্থির। এই সব নিয়েই, ঠিক সূর্যের অন্তর্ভাগের মতোই, শিশিরকুমার ক্রমাগত অন্তর্দাহে বিস্ফোরণশীল।

প্রশ্ন হল, তবুও কি সেই দ্যূতক্রীড়াঘর ছেড়ে তিনি অন্যত্র যেতে আগ্রহী? আদপেই নয়। উপরে তাঁর সংলাপের যে টুকরোটি উদ্ধৃত, সেখানেই তা স্পষ্ট। কেন নয় এবং কী রূপে নয়, তা আখ্যানভাগে দেখিয়েছেন কথাকার। সেই বিবরণের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরেই পেশ করা যেতে পারে। ক্যাসিনোর সাংস্কৃতিক পরিসর প্রসঙ্গে অঁরি লেফেভর-এর একটি পর্যবেক্ষণ এই সূত্রে স্মরণীয় ; জুয়াখানার ধাঁচই হল তা ইতিহাসের ছন্দস্পন্দ (লেফেভর-এর ভাষায় "the rhythm of history") থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়।[4] কী সেই 'রিদম' যা জুয়াড়ির চক্ষুশূল? লেফেভর-এর মতে তা হল অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং আত্মবিলোপ। কিঞ্চিৎ খোলসা করে বললে, অতীত ফিরে আসতে পারে, আবার নিজেকে মুছেও ফেলতে পারে। তাতেই জুয়াড়ির আপত্তি, কারণ তাঁর তো অবিরাম মোলাকাত চলেছে নিয়তির সঙ্গে, যার সময়াঙ্ক ফিউচার ইনডেফিনিট। কখন ঝলসে উঠবে সেই মুহূর্ত, কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে, কেউ তা জানে না। আর, জানে না বলেই নিরন্তর তারই সন্ধান। পেরো যাকে বলবেন, The purpose of this encounter is to make *the moment of the act* appear.[5] উদ্ধৃত বাক্যটিতে নজরটান যোগ করা হয়েছে, কারণ এই ভাবী-কালের মাত্রাটুকুই দ্যূতক্রীড়কের সম্বল। তাই, ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের বৃত্ত থেকে, (লোকসানের) পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান তিনি। বিগত কাসুন্দি সরিয়ে তাঁর প্রতিটি দান আদতে ভবিষ্যগামী নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়া। 'টিনের তলোয়ার'-এ হরবাবু যেমন (অ)নিশ্চিত আশ্বাসে দলমালিক মহাধনী বীরকৃষ্ণকে বলেছিলেন: 'না, এ বার যে পেলে (প্লে) হবে, একদম কেল্লা ফতে! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' শুনে ঝানু মুৎসুদ্দি বীরকৃষ্ণের দ্রুত প্রতিক্রিয়া, 'পেত্যয় হয় না!'[6] তাতে অবশ্য কাপ্তেন বেণীর বয়েই গেল। তিনি তো দান চালতে বদ্ধপরিকর। ঠিক যেমন, এই উপন্যাসের বড়োবাবু। পাশা নিয়ে ঘর করি, পাশায় পকেট ভরি, তা হলে আর নিয়তির সঙ্গে বারবার দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হতে আপত্তি কোথায়?

এই ভাবে, জুয়াড়ির 'ঘটমান বর্তমান'কে অধিগ্রহণ করে ফেলে 'অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ', অর্থাৎ নিয়তি। তিনিও, উপন্যাসের শিশিরকুমারের কথামতো, ক্রমাগত তিন তাস ফেলে চলেন জীবনের মাটিতে।

৩

তা বলে সংশয়-টংশয় সব উধাও হয়ে যাবে? 'দ্য গ্রেট বেঙ্গল অপেরা'র কাপ্তেনবাবু জানতেন, যাবে না। 'নাট্যমন্দির'-এর বড়োবাবুও জানতেন, যাবে না। সেই বস্তুটি চলে গেলে দ্যূতক্রীড়া জমেই বা কী করে? তাই, নিয়তির সঙ্গে মোকাবিলা ঘিরে তৈরি হয় যে সংশয়ের অধিবৃত্ত, সেটাই দ্যূতক্রীড়া-পরিসরে 'অনুমান' হয়ে দেখা দেয় — a space of doubt that masquerades as anticipation[7] — বিচিত্র সেই ভবিষ্যপথের পাঁচালি ছেড়ে জুয়াড়ি একটি পা-ও নড়তে নারাজ। স্বপ্নঘোরের সেই কথালাপে শিশির যখন দাবি করেছিলেন, মরুভূমির মধ্যে শীতল মরূদ্যানের দেখা মিলবেই, তখন হরিদাস ভাদুড়ি (নাকি, শিশিরকুমারেরই সুপার-ইগো) উচ্চারণ করেছিল কঠোর চেতাবনি :

> আসবে না হে শিশির। আসবে না। এসব কাল্পনিক অলীককুসুম স্বপ্ন ভেবে আর জীবন কাটিও না। ৪২ বছর বয়স হল তোমার। বেয়াড়াপনা বন্ধ করো। স্বাভাবিক নর্মাল মানুষ হয়ে যাও। প্রকৃতি এইসব যাচ্ছেতাই অস্বাভাবিকতা মোটে সইতে পারে না।[8]

তবে, সেই কাল্পনিক হরিদাস (নামান্তরে, দ্বিতীয় শিশিরকুমার) জানতেন, এ হেন জাগতিক স্বাভাবিকতায় তাঁর পরিক্রমণ অসম্ভব। প্রকৃত দ্যূতক্রীড়কের প্রকৃতি সম্পর্কে ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ, সে নিশ্চিতিকে পরিহার করে অনিশ্চিতেই বাস করে — a desire to "avoid certainty and remain in doubt"[9] — আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, একই দশা শিশিরকুমারেরও। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, যখন সেই স্বচয়িত সংশয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় কিছু রিপু-প্রহার। সতু সেনের উদ্যোগে যখন শিশিরকুমারের সদলবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রার সুযোগ এল, তখনই মিথ-বর্ণিত বীরশ্রেষ্ঠ আকিলিস-এর ভঙ্গুর গোড়ালির মতো শিশিরকুমারের মগজে গজাল এক ভাবনা, যার পরিণাম হল আত্মঘাতী। অতীতে যাঁরা কখনও না কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, এমন কাউকে তিনি বিদেশে নিয়ে যাবেন না। তাতে যদি আনকোরাদের নামাতে হয় মঞ্চে, তা-ই সই। কিন্তু, যাঁরা তাঁর বিদূষণে কোমর বেঁধেছিলেন, তাঁদের তিনি ছুঁয়েও দেখবেন না। এমন নয় যে, কেউ তাঁকে সতর্ক করেনি। যদিও দলের ভিতরে অধিকাংশই তাঁর বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের সাহস দেখাননি, কঙ্কাবতী দেখিয়েছিলেন। বারবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। বড়োবাবু নির্বিকার। ঔপন্যাসিক এই ট্র্যাজিক পরিস্থিতির নির্মোহ বিবরণ দিয়েছেন :

> কঙ্কাবতী আবার বোঝালেন। বস্তুত সে সময়ে অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, গোকুল নাগ, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্রের মত বহু প্রথিতযশা নট বঙ্গরঙ্গমঞ্চের চৌহদ্দিতে বিদ্যমান। এমনকি বৃদ্ধ দানীবাবুও তখন জীবিত এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে টেনশন বা আকচা আকচি থাকলেও, প্রত্যেকে নট ও নির্দেশক শিশিরকুমার সম্পর্কে অতীব শ্রদ্ধাশীল। খুব ভুল কিছু বলেনি কঙ্কাবতী। শিশিরকুমার যদি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তথা স্বার্থটি মাথায় রেখে সকলকে একযোগে ডাক দিতেন, অনেকেই শিশিরকুমারের সঙ্গে আমেরিকা যেতে রাজি হয়ে যেতেন। কিন্তু বড়োবাবুর এক গোঁ। প্রয়োজনে নতুনদের দিয়ে অভিনয় করাবো, কিন্তু যাঁদের অনেকেই ভেতরে ভেতরে তাঁর সম্পর্কে মাৎসর্য পোষণ করে এসেছেন বা তাঁকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চাননি বা চোরাগোপ্তা বাঘনখ পিঠে বসিয়ে দিতে চেয়েছেন, সেই সব আফজল খাঁ-দের নিয়ে মারহাট্টার শিবাজীর পক্ষে জাহাজের ডেকে বসে এতদিন ধরে একত্রে হুইস্কিপান অসম্ভব শুধু নয়, কল্পনাতীত।
>
> ফলে প্রাচীনকালের পেরিক্লিসিয় এথেন্সে নির্মিত ট্র্যাজেডিপুঞ্জের সঙ্গে উত্তরকালীন এলিজাবেথান শেক্সপিরিয় ট্রাজেডির যেটি মূল পার্থক্য, অর্থাৎ দৈবশক্তি বা ভাগ্যদেবী নামক নিয়তি নয় বরং নায়কের চরিত্রের অন্তর্গত কোনো ত্রুটি বা 'হামারশিয়া' সেই নায়কের জীবনে আশু এক ট্র্যাজেডি ডেকে আনে এবং সেই ট্র্যাজেডি সন্দর্শনে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয় অনিবার্য কোনো ক্যাথারসিস, ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ির তা খুব ভালো করে জানা থাকলেও, হ্যামলেটের 'দ্বিধা'র মতোই, ম্যাকবেথের 'উচ্চাশা'-র মতোই, ওথেলোর 'সন্দেহ'-র মতোই, লিয়ারের 'অতি-বাৎসল্য'-র মতোই তাঁর জীবনে এখন বিশেষ যে 'হামারশিয়া'টি সক্রিয় হয়ে উঠল, তা হল টিপিক্যাল বাঙালি মধ্যবিত্ত এক 'গুমোর'। যে গুমোরকে অ্যাভারেজ মানুষ আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মান ইত্যাদি ভারি ভারি বা দামি দামি শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে এবং নিজেকে স্তোক দিতে বিশেষ পছন্দ করে। মধ্যবিত্তের যে মধ্যচিত্ততা থেকে নিজেকে এবং বাংলা থিয়েটারকে আজীবন দূরে রাখতে চাইতেন শিশিরকুমার, পাকাপাকি মঞ্চ খোয়ানোর বিনাশকালে মানসিক দ্যূতক্রীড়ার সেই অক্ষপাশ থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারলেন না বড়োবাবু। সহধর্মী কঙ্কাবতীর যথোচিত আপত্তি ও বারণ সত্ত্বেও।[10]

এইখানে এসে দ্যূতক্রীড়কটি একটু গুলিয়ে ফেললেন তাঁর রাস্তা। প্রকৃত শিল্পীর মতো তিনি বহু অর্থের প্রলোভনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মার্কিন মুলুকে নাচগানহাতিঘোড়া মেশানো একটি সার্কাস-প্রতিম পারফরম্যান্স মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব ফুৎকারে ওড়ালেন বটে, নিয়তির সঙ্গে মোকাবিলায় নিজের দানটি চালতে তৈরিও হলেন, কিন্তু ততদিনে ভুল অভিনেতাদি বেছে যে ক্ষতি তিনি করে ফেলেছেন, তা অপূরণীয়। দ্যূতক্রীড়ক হওয়ার সুবাদে তাঁর তো অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে এগোনোর কথা। তিনি এগোলেনও, অথচ, সেই রাস্তায় তাঁর ব্যক্তিগত অতীত ক্রমাগত তাঁর পথরোধ করল। অ্যালান পেরো-র পর্যবেক্ষণ, জুয়াড়ির জীবনে সংশয় তো নিত্যসহচর, দান ফেলে হারের ভয়টুকুও গা-সওয়া, কিন্তু সত্যিই যা তাকে চিন্তায় ফেলে, তা হল উদ্বেগ :

> The anxiety the gambler experiences does not come from a fear of losing; it comes from the failure to enjoy the space of doubt produced by it.[11]

ঠিক সেই ব্যাপারটিই ঘটল মার্কিন মুলুকে। যে নাট্যকর্মের গভীর অনিশ্চিতি শিশিরকুমার উপভোগ করেছেন, হার-জিতের তোয়াক্কা না রেখেই উপভোগ করেছেন, কখনও জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য দুলেছে কণ্ঠে, কখনও হানা দিয়েছে নিঃসঙ্গতা, তৎসত্ত্বেও তিনি নিজের পথ থেকে চ্যুত হননি কখনও — প্রবাসে সেই নাট্যকর্মই চূড়ান্ত বিফলতা হেতু তাঁর কাছে বিষবৎ হয়ে দেখা দিল। তা-ও একেবারেই স্বকৃতকর্মের পরিণামবশত। আশ্চর্য নয় যে ফিরতি পথে জাহাজে যখন পিতা হরিদাস দেখা দেবেন তাঁর সামনে (কিংবা শিশিরকুমারের মুখোমুখি হবেন শিশিরকুমার) তখন সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁকে তীব্র গঞ্জনা দিয়ে বলবেন :

> যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। শিল্পচর্চা করে হাতির মাথা হবে। এসব বন্ধ করো।...সব তো খুইয়েছ...কঙ্কাবতীকে ঠিক করে খেতে দিতে পারবে তো দুমুঠো? কী হে অপটু জুয়াড়ি?[12]

প্রত্যাশিত ভাবেই শিশিরকুমার তাঁর পথ থেকে সরবেন না বটে, কিন্তু পাঠকের মনে ততক্ষণে বীজাকারে ঢুকেছে একটি প্রশ্ন, কে অপটু জুয়াড়ি? কী তার লক্ষণচিহ্ন? এই প্রশ্নের উত্তর, ১৯৭৬ সালে একটি গানে, দিয়েছিলেন Don Schlitz, গানটির নাম ছিল The Gambler — এই গানটি ডোনাল্ড, সংক্ষিপ্ত নামে ডন নিজে গেয়েছিলেন, তা ছাড়া একাধিক ব্যক্তি গেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর কণ্ঠে গানটি কিংবদন্তির মর্যাদা পেল, জনপ্রিয়তার রেকর্ড ইত্যাদি ভেঙে তালিকার শীর্ষে উঠে গেল, তাঁর নাম কেনি রজার্স। কী লেখা ছিল সেই গানে? দু'টি চরণ মনে আসবে এই সূত্রে :

> You got to know when to hold'em, know when to fold'em,
> know when to walk away, and know when to run.[13]

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কি ছিল এই খেলার প্রতিভা? কখন ধরে রাখতে হয়, কখন ছাড়তে হয়, কখনই বা প্রস্থান করতে হয় দ্যূতক্রীড়াকক্ষ থেকে, সে সবের নিখুঁত হিসাব আয়ত্তে ছিল তাঁর? তিনি তো জানতেন, 'তখন তাহারা সুখে দ্যূতক্রীড়া করে' গোছের বাক্যবন্ধ তাঁর বরাতে কোনও দিনই জুটবে না শুধু নয়, নাটমঞ্চে দ্যূতক্রীড়ক হিসাবে সেই জাতীয় সহজ সুখ তিনি আশাও করতে পারেন না হয়ত। সুখসাগরে ডুব দিতে হলে এই খেলায় নামলে চলবে না। অথচ, যতটা নৈপুণ্যে তিনি নিতান্ত যুবাবয়সেই স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সামনে 'চাণক্য' চরিত্রটির সুগভীর ব্যাখ্যা করতে পারতেন, ততটা দক্ষতা কি নটজীবনের এই অক্ষক্রীড়ায় দেখাতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত? খুঁজে পেয়েছিলেন এই খেলায় দান ধরে রাখা বা ছাড়া, কখনও আক্রমণ, কখনও আবার পিঠটানের সুলুক? নাকি, শ্লিট্‌জ/রজার্সের গানের মুখে দুয়ো দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যে যেতে হয় যাক, আমি কোথাও যাব না। আমার এ ঘর বহু যতন করে, ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে, আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে...

দাঁড়ান, বড়োবাবু! কে আসবে? নিয়তি? তারই আশায় আপনি একের পর এক পাশার দান চেলে চলেছেন?

পাঠকের এই প্রশ্ন শুনে জাহাজের ডেক-এ দণ্ডায়মান শিশিরকুমার সহসা কিছু বললেন না। মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটে উঠল বুঝি! তারপর, ধীর, গম্ভীর গলায় ডাকলেন, কঙ্কা...!

---

[1] উদ্ধৃত করেছেন ওয়াল্টার বেনিয়ামিন (The Arcades Project, W. Benjamin. Harvard University Press, Cambridge (Mass.); London, (2003); 498)

[2] Pero, Allan. 'Time Enough for Countin' : Gambling and the Event-effect as Symptom' (https://www.lacan.com/symptom7_articles/gambling.html)

[3] শারদীয় আজকাল, পৃষ্ঠা ৩৬০

[4] Lefebvre, Henri (2013). Rhythmanalysis : Space, Time and Everyday Life, New York : Bloomsbury Academic; 51

[5] Pero, Allan. op. cit.

[6] দত্ত, উৎপল (বৈশাখ ১৪০৭) টিনের তলোয়ার. জাতীয় সাহিত্য পরিষদ; ৩৮

[7] Pero, Allan. op. cit.

[8] শারদীয় আজকাল, পৃষ্ঠা ৩৬০

[9] Freud, Sigmund (1990). Case Histories 2. Penguin; 112

[10] শারদীয় আজকাল, পৃষ্ঠা ৩৩৫

[11] Pero, Allan. op. cit.

[12] শারদীয় আজকাল, পৃষ্ঠা ৩৬১

[13] https://genius.com/Kenny-rogers-the-gambler-lyrics

শোভন তরফদার : গবেষক, তথ্যচিত্রকার ও প্রাবন্ধিক। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল সদস্য।